সূচিপত্র

দুঃখ-প্লাবন দিনে ১৩

সুতরাং, কোথায় যাচ্ছ? ২১

হয়তো-বা তার মন ভালো নেই ৩২

জীবনের পাঁচ সুতো ৩৯

আমি তোমাদের বন্ধু নই ৫৯

সত্যের সাথে সংসার ৭২

ঘটনার ঘনঘটায় জীবনের রূপ ৭৮

হায়াতের দিন ফুরোলে ৯০

হৃদয়ের রোগ ৯৮

তাহাদের আয়নাতে আমাদের মুখ ১১৩

চাঁদের জীবন ১২৩

বিত্তের ব্যবচ্ছেদ ১২৮

Student Valy

যে স্বপ্ন জীবনের চেয়ে বড় ১৩৮

বাড়তি দুটো সিজদাহ ১৪৩

শুভাকাঙ্ক্ষী অথবা শুভংকরের ফাঁকি ১৪৯

একই মৃত্যু, ভিন্ন রেখাপাতে ১৫৫

চোখ ঘুম ঘুম রাত্রি নিঝুম নিঝঝুম নিরালায় ১৬১

Stack Daily

হয়তো-বা তার মন ভালো নেই

১

বাবার কাছে আত্মীয়-স্বজন আর প্রতিবেশীদের খোঁজখবর নিচ্ছিলাম। একজন আত্মীয়ের কথা জিগ্যেশ করাতে বাবা বললেন, 'ভালোই তো আছে দেখলাম। আগে দেখা হলে কেমন আছি জিগ্যেশ করত। বিগত কয়েকদিনে দুইবার দেখা হলো। কেমন আছি জানতে চাওয়া তো দূর, সালামটা পর্যন্ত দিলো না।'

বাবার আক্ষেপ হলো—যেহেতু বাবা বয়সে বড় এবং অধিকতর অসুস্থ, ওই আত্মীয়ের উচিত ছিল দেখামাত্র আগে বাবাকে সালাম দেওয়া এবং কুশলাদি জিগ্যেশ করা। আমাদের ওই আত্মীয় এই কাজ অবশ্য সর্বদাই করে। তবে, যেহেতু শেষ দুই সাক্ষাতে বাবাকে সে সালাম দেয়নি এবং কুশলাদিও জানতে চায়নি, বাবার ধারণামতে হয় সে বাবাকে অবজ্ঞা করেছে, নয়তো অহংকারী হয়ে গেছে।

বাবার এমন চিন্তা আমার কাছে প্রশ্রয় পেল না। শুধরে দিয়ে বললাম, 'আপনি যেরকম ভাবছেন ব্যাপারটা তো সেরকম না-ও হতে পারে। মানুষের মন-মেজাজ-মর্জি সবসময় কি একইরকম থাকে? এমন কি হতে পারে না যে—কোনোকিছু নিয়ে সে ভীষণ চিন্তিত? হয়তো আর্থিক টানাপোড়েনে

দিন যাচ্ছে তার। হয়তো শরীরটা ভালো যাচ্ছে না, অথবা—ছেলেমেয়েদের, কিংবা নাতি-নাতনিদের অসুখ-বিসুখের কারণে মনটা খুবই উদাসীন? কত ধরনের সুবিধা-অসুবিধার মধ্যেই তো মানুষকে বাঁচতে হয়। তা সত্ত্বেও মানুষেরা যে আমাদের সাথে হাসিমুখে কথা বলে, কুশলাদি জানতে চায়, খোঁজখবর রাখে—এই জন্য আমাদের উচিত তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা। কেউ যদি কখনো সেটা না করতে পারে, তার ব্যাপারে মন্দ না ভেবে, সুধারণা করাই উত্তম।'

২

এমনটা আমাদের সাথে হয়। প্রায় প্রতিদিন কথা হয় এমন কেউ হয়তো দীর্ঘদিন আমাদের খোঁজখবর নিতে অপারগ হতে পারে। সর্বদা মুখে হাসি জিইয়ে থাকে এমন কাউকেও আমরা মাঝে মাঝে বিষণ্ন চেহারায় আবিষ্কার করতে পারি। কাউকে অনলাইনে ম্যাসেজ করেছি, সে হয়তো ম্যাসেজটা সীন করেছে কিন্তু উত্তর করেনি। তার মানে কি সর্বদা এটাই যে—সেই লোক আমাকে পাত্তা দেয়নি? উহুঁ, ব্যাপারটা সবসময় এত সরল নয়।

জীবনে আমরা সবাই যে সর্বদা সুখের সাগরে হাবুডুবু খাই তা কিন্তু নয়। সেখানে আমাদের সুখ যেমন আছে, আছে দুঃখও। অর্থের টানাটানি, সম্পর্কের টানাপোড়েন, অসুখ-বিসুখের হাতছানি। কোনো কারণ যদি না-ও থাকে, একেবারে বিনা কারণেও আমাদের মন উদাস আর বিষণ্ন হয়ে থাকতে পারে। জীবনের এমন মুহূর্ত যখন কেউ পার করে, তার কাছে চারপাশের দুনিয়াটাকে তখন একটু বিস্বাদ লাগাই স্বাভাবিক। বাঁচার তাগিদে তাকে হয়তো আপনার সামনে আসতে হয়, কিন্তু হাসবার যে শক্তি, সেটা তার মনে আপাতত অবশিষ্ট নেই। রাস্তায় হয়তো তার

আমি তোমাদের বন্ধু নই

১

আমার আপারা ঢাকায় খুব একটা আসার সুযোগ পায় না। সংসার, বাচ্চা-কাচ্চা সামলিয়ে ভাইয়ের কাছে এসে বেড়িয়ে যাবে—এমন অবসর তাদের জীবনে খুব ঘন ঘন আসে না বললেই চলে। শেষবার যখন বড় আপা আর মেঝো আপা আমার ঢাকার বাসায় এলেন, জোরপূর্বক তাদেরকে অনেকদিন রেখে দিলাম। ভাই-বোন মিলে কত গল্প আড্ডা, একসাথে কত স্মৃতি রোমন্থন করা যায়!

'ফাস্টফুড' নামের যে বস্তুগুলো শহুরে জীবনে আমরা খাই নিয়মিত—অবসর, আড্ডা আর অবকাশ যাপনে, সেসবের সাথে গ্রামের মানুষজন তেমন অভ্যস্ত হতে পারে না। আব্বাকে জীবনেও বার্গার মুখে তোলাতে পারিনি। শর্মা জিনিসটা মুখে নিয়েই আম্মা হাসা শুরু করেন। পিজ্জার কথা তো বাদই দিলাম। যেসব খাবার ছাড়া শহুরে মধ্যবিত্তের অন্তরাত্মা বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়, সেসব খাবারে গ্রামের মানুষজনের এমন অরুচি বেশ উপভোগ করার মতোই ব্যাপার!

যাহোক, সেবার মনে হলো আপাদেরকে বাইরের খাবার-দাবারও কিছু খাওয়ানো যাক। কী খাওয়াব কী খাওয়াব ভাবতে ভাবতেই মেয়ের মা

বললেন, 'ফ্রাইড রাইস, ফ্রাইড চিকেন আর সাথে স্যুপ আনা যায়।'

চমৎকার আইডিয়া! আপাদেরকে না জানিয়েই বেরিয়ে গেলাম পার্শ্ববর্তী রেস্টুরেন্টের উদ্দেশে। রেস্টুরেন্টে পৌঁছে খাবারগুলো অর্ডার করে আমি তাদের মেন্যুটায় আরেকবার চোখ বোলাচ্ছি এই আশায় যে—অর্ডারকৃত খাবার প্রস্তুত হয়ে আসার মাঝে আমি হালকা-পাতলা কিছু খেয়ে নিতে পারি কি না।

ঘরোয়া রেস্টুরেন্ট—পরিবার-পরিজন নিয়ে এসে নিভৃতে বসে খাওয়া-দাওয়া করার মতো পরিবেশ। আমি বসেছি একেবারে শেষের দিকটায়। যেহেতু বাসার পাশে, তাই অনিয়মিত হলেও এখানে আমার আসা-যাওয়া আছে। অন্যান্য দিনের তুলনায় সেদিন রেস্টুরেন্টে প্রচণ্ড আওয়াজ আর শোরগোলের উপস্থিতি। ঘটনা হলো—কলেজ অথবা সদ্য ইউনিভার্সিটিতে যাওয়া একদল ছেলেমেয়ে দলবেঁধে খেতে এসেছে রেস্টুরেন্টে। আমার টেবিলের দু'টেবিল সামনে তিন থেকে চারটা টেবিলকে লম্বালম্বি করে পেতে তাদেরকে বসতে দেওয়া হয়েছে। তারা খাচ্ছে এবং সাথে প্রচণ্ড হৈ-হুল্লোড় করছে। নতুন নতুন কলেজ আর ইউনিভার্সিটিতে গেলে রক্তে যে জোশ আর শরীরে যে চাঙা ভাবটা থাকে—এসব তারই সমষ্টি। সুতরাং অবাক হচ্ছিলাম না একটুও।

আমি আমার মতো করেই সময় কাটাচ্ছিলাম, হঠাৎ এত শোরগোলের মাঝেও তাদের একটা কথা আমার কানে এসে আটকে গেল। মেয়েদের কেউ একজন জিগ্যেশ করছে, 'আরেহ, সাগর আসলো না কেন আজকে?'

ছেলেদের মধ্য থেকে উৎসাহী একজন বলল, 'আর বইলো না! সাগর তো এখন আগাগোড়া হুজুর হইয়া গেছে। মেয়েদের সাথে কোনো প্রোগ্রামে যায় না।'

ঘটনার ঘনঘটায় জীবনের রূপ

১

একটা রেস্টুরেন্টে খেতে বসেছি আমরা চার বন্ধু। রেস্টুরেন্টের মেন্যু হাতে যিনি এগিয়ে এলেন তাকে আমাদেরই একজন বললেন, 'এখানে তো সেট মেন্যুগুলো সব ১:৩। ১:৪ এর কোনো সেট মেন্যু নেই?'

মেন্যু হাতে আসা লোকটা আমাদের কোনো জবাব দেওয়ার আগে সম্মুখে উপবিষ্ট রেস্টুরেন্ট ম্যানেজার গলা চড়িয়ে বললেন, 'মেন্যুতে কোথাও কি ১:৪ লেখা আছে? লেখা যেহেতু নাই, সুতরাং ১:৪ বলেও কিছু নাই এখানে।'

Stack Valy

আমরা চারজনই রীতিমতো হাঁ হয়ে গেলাম! কাস্টমারের একটা সরল প্রশ্নের জবাব একজন ম্যানেজার এভাবে দিতে পারে তা একেবারেই কল্পনাতীত! ব্যাপারটা সেখানে থেমে গেলে তো পারত, কিন্তু ভদ্রলোক তার উপবিষ্ট জায়গা থেকে রীতিমতো ঝগড়া শুরু করে দিলেন। গলার আওয়াজ এত চড়া আর এত তির্যক যে—মনে হলো তিনি আমাদের কাছে টাকা পান অথবা তার সাথে জমিজমা-সংক্রান্ত ঘোরতর বিরোধ আছে আমাদের।

আমাদের চারজনের মধ্যে আমি ছাড়া বাকি তিনজনের সকলেই সরাসরি

ব্যবসা এবং সেবার সাথে জড়িত। একজন হসপিটালের মালিক, একজন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, যার রয়েছে নিজস্ব কনসালটেন্সি ফার্ম। আর অন্যজন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠিত দুইটা প্রকাশনার কর্ণধার। তাদের প্রত্যেকেরই আছে গ্রাহক সেবার মাঠপর্যায়ের অভিজ্ঞতা। এমতাবস্থায় সেই রেস্টুরেন্টে গ্রাহক সেবার এমন নতুন রূপ দেখে হতভম্ব না হয়ে উপায় কী!

সাধারণত যেটা হয়—রেস্টুরেন্ট-বয়রা হয়তো খানিকটা ভুলচুক করে ফেলে কাস্টমারের সাথে এবং ম্যানেজার এসে সেটা সামাল দেন। তিনি অন্যদের হয়ে স্যরি বলেন, নিজে যুক্ত হয়ে বিষয়গুলো মিটমাট করে দেন। কিন্তু এখানে ব্যাপারটা হয়ে গেছে ১৮০ ডিগ্রি বিপরীত! রেস্টুরেন্ট-বয়গুলো ম্যানেজারের পক্ষ হয়ে আমাদেরকে কমপক্ষে ত্রিশবারের বেশি স্যরি বললেও, ম্যানেজার সাহেব তার গরম মেজাজ দেখিয়েই যাচ্ছেন। ঘটনার আকস্মিকতায় আমাদের তো আকাশ থেকে পড়বার মতো অবস্থা!

যাহোক, বের হয়ে আমরা অন্য রেস্টুরেন্টে ঢুকলাম। শুক্রবারের দিন—কয়েকজন বন্ধু মিলে একটু খোশগল্প, কিছু কাজের কথা, একটু খাওয়া-দাওয়া করব এমন নিয়তে বসা, কিন্তু তিরিক্ষি মেজাজের এক লোক সমস্ত আয়োজনে পানি ঢেলে দিলো। সকলের ফুরফুরে মন চাপা একটা বিষণ্ণতায় ছেয়ে গেল। কিন্তু, এই বিপর্যস্ত অবস্থা থেকে তো মুক্তি দরকার। এমন গুমোট পরিবেশে না খাওয়া যায় আর না কথা বলা যায়।

মানসিক এই টানাপোড়েন থেকে আমাদের টেনে তোলার দায়িত্ব নিতে এগিয়ে এলেন আমাদেরই একজন। খানিক আগের সেই বাজে অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরে তিনি বললেন—'দেখুন, পুরুষ মানুষের জীবনটা আসলে গুলিস্তান থেকে চিটাগাং রোড আসার সময়টুকুর মতো। এই সময়টুকুর ভেতরে একজন পুরুষ মুখোমুখি হতে পারে অনেক অনেক ঘটনার। প্রথমে আধ ঘণ্টা গুলিস্তানে দাঁড়িয়ে বাসের জন্য তার অপেক্ষা করা লাগতে পারে। বাসে সিট না থাকলে কখনো দাঁড়িয়ে, আবার কখনো

হৃদয়ের রোগ

১

একবার ফেসবুকের ছোট একটা পোস্টে লিখেছিলাম—‘গর্ভবতী নারী কখনোই রোগী নয়। দুনিয়াতে কোনো রোগীই তার রোগকে শরীরের ভেতরে আদর-যত্ন করে বড় করে তোলে না। গর্ভবতী নারী একজন যোদ্ধা, একজন মহীয়সী। সে তার ভেতরে বড় করে তোলে আস্ত একটা পৃথিবী।’

লেখাটার পেছনে একটা প্রেক্ষাপট ছিল। আমার বড় মেয়ে আয়িশা তখন পেটে। এত দিন আমার স্ত্রীকে আমি কেবল ‘স্ত্রী’ হিশেবে চিনেছি, কিন্তু আয়িশার অস্তিত্বের সংবাদ পাওয়ার পরের সময়টুকুতে তাকে আমি আবিষ্কার করেছি ভিন্ন একটা রূপেও—মা হতে যাওয়া চপলা এক রমণী যে অপেক্ষা করে আছে তার স্বপ্নের পৃথিবীতে নতুন এক চারাগাছের অঙ্কুরোদগমের জন্য। প্রচণ্ড ব্যথায় যখন তাকে কুঁকড়ে যেতে দেখতাম, আমার বুকের ধড়ফড়ানি তখন বেড়ে যেত। আমাকে অস্থির হতে দেখে তিনি বলতেন—‘আরেহ, এই সময়ে এরকম হওয়াটাই স্বাভাবিক। এত অস্থির হচ্ছেন কেন? দেখবেন সব ঠিক হয়ে যাবে, ইন শা আল্লাহ।’

শরীরের ব্যথায় নড়তে-চড়তে পারেন না, কিন্তু জোরাজুরি করেও আমি

Stack Valy

তাকে একটা প্যারাসিটামল খাওয়াতে পারিনি। বলতেন, 'আমার বাচ্চাটার যদি কোনো ক্ষতি হয়ে যায়?'

যাকে এখনো চোখে দেখেননি, যার গলার আওয়াজ শোনেননি শুধু অদৃশ্য স্পর্শ অনুভব ছাড়া—তার জন্য যাবতীয় ব্যথা, যাবতীয় রোগকে কীরকম হাসিমুখে মেনে নিচ্ছেন তিনি! সহৃদয় পাঠক, অনাগত সন্তানের জন্য ব্যাকুল হয়ে যিনি নিজের শরীরের যন্ত্রণাকেও হাসিমুখে মেনে নিতে পারেন, তাকে আমি রোগী বলতে যাব কোন দুঃসাহসে? মূলত আমার স্ত্রীকে কল্পনাতে রেখেই আমার ওই ফেসবুক পোস্টের অবতারণা।

কিন্তু মুসিবত হয়েছে অন্য জায়গায়। পোস্টটা দেওয়ার কয়েকদিন পরে পরিচিত একজন ভাই আমাকে ইনবক্সে অন্য একটা পোস্টের লিঙ্ক দিয়ে বললেন, 'আপনাকে নিয়েই লেখা। পড়ে দেখতে পারেন।'

যথারীতি লিঙ্কে ক্লিক করলাম, কিন্তু যা দেখলাম তাতে আমার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। 'গর্ভবতী নারী রোগী নয়' মর্মে আমার ছোট্ট যে লেখা, সেই লেখাটা একজন বোন শেয়ার দিয়ে আমার সাথে দ্বিমত করেছেন। তার কথা হচ্ছে আমি ভুল বলেছি। গর্ভবতী নারীকে মহান করে দেখাতে গিয়ে পরোক্ষভাবে আমি তাদের শারীরিক পরিবর্তনটাকে 'ছোট' করে দেখাচ্ছি। এতে করে মানুষ গর্ভবতী নারীদের যত্ন নেওয়া কমিয়ে দিতে পারে। কিন্তু এ-ধরনের দ্বিমতে তো আপত্তির কিছু নেই, বরং পরিশীলিত চিন্তার জন্য এ-ধরনের দ্বিমত সবিশেষ উপকারী। কিন্তু ঘটনা অন্য জায়গায়। দ্বিমত পোষণ করা সেই বোনের লেখায় আরেকজন বোন যা কমেন্ট করেছেন তা সুস্থ চিন্তার কোনো মানুষের কল্পনাতে যে আসা সম্ভব—সেটা কল্পনা করাও দুরূহ। ওই পোস্টের নিচে তিনি লিখেছেন,

তাহাদের আয়নাতে আমাদের মুখ

১

ইমাম বুখারি রহিমাহুল্লাহর জীবনীতে পাওয়া যায়—*সহীহুল বুখারি*-তে প্রতিটা হাদীস লিপিবদ্ধ করার আগে তিনি মসজিদে নববিতে দুই রাক'আত ইস্তিখারার সালাত আদায় করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতেন।[১] *সহীহুল বুখারি*-তে সর্বমোট হাদীসের সংখ্যা প্রায় ৭৫০০। প্রতিটি হাদীসের জন্য দুই রাক'আত করে সালাত আদায় করলে তিনি উক্ত কাজের জন্য শুধু ইস্তিখারার সালাতই পড়েছেন ১৫,০০০ রাক'আত! আরও স্পষ্টভাবে বললে—৭৫০০ হাদীসের জন্য ইমাম বুখারি ৭৫০০ বার জায়নামাজে দাঁড়িয়েছেন!

Stack Valy

শুধু হাদীস লিপিবদ্ধ করার সময়ে উনি যে নফল সালাত আদায় করতেন, এটা কেবল সেই হিশেব। তার তাহাজ্জুদ সালাতের হিশেব, ফরজ ও সুন্নাহ সালাতের হিশেব, অন্যান্য নফল সালাতের হিশেব, নফল সিয়াম, কুরআন তিলাওয়াত, যিকির-আযকারসহ নানাবিধ ইবাদাতের হিশেব তো এখানে আসেইনি!

---

১. ইবনু হাজার আসকালানি, হাদ্‌য়ুস সারি মুকাদিমাতু ফাতহিল বারী, ৪৮৯; তাগলীকুত-তা'লীক, ৫/৫২১।

৪

শুধু ইমাম বুখারি, ইমাম নববি আর ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ রহিমাহুমুল্লাহ-ই নন, ইসলামের ইতিহাসে আপন আলোয় ভাস্বর হয়ে আছেন এমন অসংখ্য-অগণিত মহামানব যারা নিজেদের কীর্তিতে ছিলেন সমুজ্জ্বল। ইবনু জারীর আত-তাবারির *তারীখুত তাবারি* এবং *তাফসীরুত তাবারি* দুইটা গ্রন্থই প্রায় সাত হাজার পৃষ্ঠা কলেবরের। জানা যায়—ইবনু জারীর আত-তাবারি রহিমাহুল্লাহর লিখিত বইয়ের মোট পৃষ্ঠাসংখ্যা ৩ লক্ষ ৫৮ হাজার! যেখানে একজন লোক একজীবনে টেবিলে দিনরাত বসে থাকলেও একলক্ষ পৃষ্ঠা লিখতে হিমশিম খেয়ে যাবে, সেখানে ইতিহাস আর তাফসীর শাস্ত্রের মহান এই ইমাম একাই রচনা করেছেন সাড়ে তিন লক্ষ পৃষ্ঠা! তা-ও সেসব ফুল-পাখি-লতা-পাতা নিয়ে বানানো কোনো গল্প উপন্যাস নয়—ইসলামের আদ্যোপান্ত ইতিহাস থেকে শুরু করে কুরআনের বিশুদ্ধ তাফসীর, যেগুলো কালজয়ী হয়ে টিকে আছে হাজার হাজার বছর! সেসব গ্রন্থ রচনা করতে গিয়ে কী পরিমাণ পড়াশুনা তাঁকে করতে হয়েছে তা কি কল্পনা করা যায়? আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার অসীম অনুগ্রহ ব্যতীত কীভাবে একজন ব্যক্তি এই অভাবনীয় কাজ সম্পাদন করতে পারেন? সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি!

হাদীস শাস্ত্রের বিদগ্ধ এক ব্যক্তি, ইমাম ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন রহিমাহুল্লাহ প্রায় ১০ লাখ হাদীস নিজের হাতে লিখেছেন। হাদীস শাস্ত্রে তাঁর বুৎপত্তি এত উচ্চতর পর্যায়ের ছিল যে—ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল রহিমাহুল্লাহ বলেছেন—ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন যে হাদীস জানেন না, সেটা আদতে কোনো হাদীস নয়।[২]

২. ইবনু হাজার আসকালানি, তাহযীবুত তাহযীব, ১৪/৫১৩।

আরবি ভাষার অভিধান নিয়ে ওরিয়েন্টালিস্ট লেখক John A. Haywood একটি বই লিখেছেন *Arabic Lexicography* নামে। সেই বইয়ের ভূমিকা অংশে অভিধান রচনায় মুসলিম লেখকদের অবদানের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন, 'Before the end of the medieval period they had produced the most exhaustive and copious dictionary in any language prior to the nineteenth century. The truth is that in lexicography—as in many other fields—the Arabs occupy a central position both in time and space; between the Ancient World and Modern, between the East and the West. If a fifteenth-century Arab could be miraculously transported into Twentieth-century Britain, he would not be at all surprised to see the volumes of the 'Oxford English Dictionary' on the library shelves: in some Europen countries, he would be surprised to see nothing compareable yet completed'.[৩]

John A. Haywood বলতে চাইছেন যে, বহু শতাব্দী পূর্বে আরব মুসলিমেরা অভিধান রচনায় যে মুন্সিয়ানা দেখিয়ে গেছেন তা কোনোকিছুর সাথে তুলনীয় নয়। তারা এত চমৎকার, এত জটিল আর বিশাল কলেবরের সব কাজ করে গেছেন যে—পঞ্চদশ শতাব্দীর কোনো আরব যদি অতীত থেকে টাইম ট্রাভেল করে বিশ শতকের ব্রিটেনে এসে অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিকশনারি দেখেন যা রচনা করা হয়েছে আধুনিক সকল প্রযুক্তি, দক্ষ লোকবল আর সরকারের নিরলস সহায়তায়, সেটা দেখেও ওই আরব একটুও বিস্মিত হবেন না। কারণ এর চেয়েও ঢের জটিল, ভারী এবং

৩. John A. Haywood, Arabic Lexicography, 14.

গোছানো কাজ বহু শতাব্দী আগে তারা একেবারে একক প্রচেষ্টায় করে রেখে গেছেন। John A. Haywood আরও বলছেন—সেই আরব ব্যক্তি ব্রিটেনে এলে তা-ও অন্তত অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিকশনারিটা দেখবেন, কিন্তু ইউরোপের অন্য কোনো দেশে, অন্য কোনো ভাষার অঞ্চলে গেলে তাকে পুরোপুরিই হতাশ হতে হবে। তিনি দেখবেন—তাদের রচনা করে যাওয়া কাজের সাথে তুলনায় আসতে পারে এমন কোনো কাজ এরা বিংশ শতাব্দীতে বসেও রচনা করতে পারেনি।

একজন ওরিয়েন্টালিস্টের মুখ থেকে মুসলমানদের কাজের এমন ভূয়সী প্রশংসা যখন বেরোয়, তখন সেই কাজের ভারত্ব, গভীরতা আর তাৎপর্য কতখানি তা সহজে অনুমেয়। তিনি অভিধান শাস্ত্রের পণ্ডিত বলে অভিধান শাস্ত্রে মুসলমানদের চিন্তা আর কাজের বিশালত্বের খোঁজ পেয়েছেন এবং অকৃপণভাবে তা স্বীকারও করেছেন। হাদীস-শাস্ত্র, তাফসীর-শাস্ত্র,

যে স্বপ্ন জীবনের চেয়ে বড়

১

‘দ্বীন থেকে দূরে চলে যাওয়া’—আজকালকার সময়ে খুব নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে। এত দিন নিয়মিত সালাত আদায় করেছে, অশ্লীলতা থেকে দূরে থেকেছে, দৃষ্টির হেফাজত করেছে, কিন্তু হঠাৎ করে কী যে হলো—সালাতে এখন অনিয়মিত, অশ্লীলতার মাঝে হাবুডুবু এবং দৃষ্টি হেফাজতের কোনো বালাই পর্যন্ত নেই। এমন অবস্থায় পতিত হয়ে অনেকে জিগ্যেশ করেন, ‘ভাই, দ্বীন থেকে দূরে সরে যাচ্ছি ধীরে ধীরে। আগের মতো টান কাজ করে না, ইবাদাতে স্বাদ পাই না। কী করতে পারি, বলেন তো?’

Stock Valy

আমল-ইবাদাত করতে হিমশিম খাওয়া, মনের অস্থিরতার জন্য সালাতে মনোযোগ কমে যাওয়া কিংবা বিভিন্ন পেরেশানির কারণে দ্বীনের সকল আহকাম পালনে পেরে না ওঠা এক জিনিস, দ্বীন থেকে ছিটকে যাওয়া, সালাত ছেড়ে দেওয়া ইত্যাদি সম্পূর্ণ অন্য জিনিস। প্রথম প্রকারের নিরাময় সহজ এবং ক্ষেত্রবিশেষে এটা আরও দুর্দান্তভাবে দ্বীনে প্রবেশের পথ তৈরি করে। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারের নিরাময় অত্যন্ত কঠিন এবং এটা অন্তরে এমন এক মরিচা ধরিয়ে দিয়ে যায় যা অনেক সময় মানুষকে কুফরের পথে পর্যন্ত ধাবিত করে।

আপনি সালাতে যাচ্ছেন, কিন্তু মনে হচ্ছে সালাত পড়ে আগের মতো তৃপ্তি পাচ্ছেন না। এই তৃপ্তি না পাওয়া আপনাকে অস্থির করে তোলে। সালাতে খুশু তথা প্রশান্তি কীভাবে আনা যায় সেই চিন্তায় আপনি বিভোর হন। আগে বেশ আমল করতেন, নফল ইবাদাতের কোনোকিছুই ছুটে যেত না। কিন্তু আজকাল ফরজ আদায় করতেই হিমশিম খেয়ে যাচ্ছেন। আপনার মনের মধ্যে একটা যুদ্ধ শুরু হয়—আগের মতো আমল-ইবাদাতে ফেরার যুদ্ধ। এই যদি হয় আপনার অবস্থা, তাহলে সাধুবাদ। আপনার অন্তরে এখনো একটা আলো বিদ্যমান আছে যা আপনাকে রাস্তা দেখিয়ে যাবে। সালাতে খুশু ফিরে পাওয়ার এই হাপিত্যেশ, দ্বীনে পুরোপুরিভাবে ফিরে আসার এই যুদ্ধ সেই আলোরই প্রতিফলন।

সালাতের ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু সালাতে যাওয়ার বা জায়নামাজে দাঁড়ানোর কোনো তাগাদা আপনি ভেতরে অনুভব করছেন না, যেকোনো হারাম জিনিসে অনায়াসে ডুবিয়ে দিচ্ছেন চোখ, অশ্লীলতায় গা ভাসাতে আপনার ভেতর দ্বিতীয় কোনো চিন্তা, কোনো ভয় কাজ করছে না, হারাম উপার্জনে পকেট ভরাতেও আপনার ভেতরটা বিদ্রোহ করে বসছে না—এই যদি হয় ঘটনা, তাহলে আপনার অন্তরের শেষ আলোটুকুও আর অবশিষ্ট নেই। সেখানে প্রকট হয়েছে নিকষ কালো অন্ধকার।

'দ্বীন থেকে দূরে সরে যাচ্ছি, কী করতে পারি'—এই প্রশ্নটা যারা করেন, তাদেরকে আমি পালটা একটা প্রশ্ন করতে চাই। 'দ্বীনের জন্য প্রতিদিন কতখানি সময় আপনি বরাদ্দ করতে প্রস্তুত?'

প্রশ্নটা শুনে অনেকে মাথা চুলকান। অনেক ভেবেচিন্তে বলেন, 'আসলে, জীবনে এত ব্যস্ততা, কাজের এত চাপ যে—সব সামলে ওঠা মুশকিল হয়ে পড়ে!'

শয়তান খুব ভয়ংকরভাবে আমাদের মনস্তত্ত্ব নিয়ে খেলতে পারে। সে আমাদের এই কথা বোঝাতে সক্ষম হয়েছে যে—আমাদের যেহেতু অনেক